ক্যামেলিয়া

সুদীপ্ত দাস

গতবারও যখন আমেরিকা গেছিলাম তখন হংকংএর পুরোনো কাই-টাক্ আন্তর্যাতিক বিমান বন্দরে প্লেন চেঞ্জ করতে হয়েছিল। দিল্লী থেকে সান ফ্রান্সিস্কো যেতে হলে সাধারণত হংকং, সিঙ্গাপুর অথবা টোকিওতে একবার থামতে হয়। আমি ইউনাইটেড এআরলাইন্সে যাচ্ছিলাম। হংকংএই ওরা থামে। কাই-টাক্ বিমান বন্দরে প্লেন নামা বা ওঠার সময় আমার প্রত্যেক বারই লালমোহন বাবুর কথা মনে পড়ে। 'টিন্টোরেটোর যীশু' কাহীনিতে ফেলুদা এন্ড কোং হাজির হয়েছিলেন হংকংএ। লালমোহন বাবু প্লেন ল্যান্ডিংএর সময় আঁতকে উঠেছিলেন কারণ রান ওয়েটা পুরোপুরি সমুদ্রের মধ্যে - মনে হয় যেন সমুদ্রের মধ্যেই প্লেনটা নেমে গেল; আর সামনেই খাঁড়াই পাহাড় দেখা যায় - মনে হয় যেন প্লেনটা রান-ওয়েতে থামার আগেই সোজা পাহাড়ে গিয়ে গোঁত্তা খাবে। অনেক দিন আগে ছোটো বেলায় ফেলুদার গল্প গুলো পড়েছিলাম, অনেকাংশেই হয়ত মূল গল্পটাই ভুলে গেছি, কিন্তু লালমোহন বাবুর প্রায় সব কিছুই এখনো মনে আছে। প্রত্যেক বারই হংকংএ প্লেন ল্যান্ডিংএর সময় মনে হত যে লালমোহন বাবুর আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু এবার সেরকম কিছু হল না। হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে নেমে গিয়ে সামনে জলজ্যন্ত পাহাড়ের দিকে ধেয়ে যেতে যেতে প্লেনটা সহসা গোৎ করে থেমে গেল না। প্রথমে ভেবেছিলাম অন্য কোনো বিমান বন্দরে নামানো হচ্ছে। পরে জানা গেল যে এটাই এখন হংকংএর নতুন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর - চেক্ ল্যাপ্ কক্। শোনা গেল বিমান চালকরাও লালমোহন বাবুর মত আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন। তাদেরই সঙ্গবদ্ধ আভিযোগের ফলে হয়ত বিমান বন্দর কর্মকর্তারা নতুন বিমান বন্দর বানিয়েছেন। সেও এক এলাহি ব্যাপার। পরিত্যক্ত একটা দ্বীপকে মূল ভুখন্ডের সাথে একটা সাঁকো দিয়ে জুড়ে, কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেকে ঘষে মেজে মানুষ করার মতন - সেই পরিত্যক্ত, ঝোপে ঝাড়ে ভরা দ্বীপটাকে সযত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, অনেক যত্ন আত্তি করে অবশেষে সেখানে নতুন এক বিমানপোত বানানো হয়েছে।

চেক্ ল্যাপ্ কক্এ অপেক্ষা করতে হবে ঘন্টা পাঁচেক। প্রথম প্রথম একা একা অপেক্ষা করতে খুবই খারাপ লাগত। মাঝে মাঝে বোকা বোকাও লাগত। তারপর ধীরে ধীরে সাথে করে গাদা গুচ্ছের বই নিয়ে আসা শুরু করলাম। প্রথম আলো, পূর্ব পশ্চিম, সাহেব বিবি গোলাম এর মত অনেক মোটা মোটা উপন্যাসের গুরুভাগটাই আমি পড়ে ফেলেছি অপেক্ষা করতে করতে। এবার কি যেন মনে হল বহুবার পড়া রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা বই সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। 'শেষের কবিতা' মাঝে মাঝেই পড়ি, তবে 'পুনশ্চ' কয়েক বছরের মধ্যে একবারও পড়ি নি। হালে একটা বাতিক হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত পড়ার - বহু শোনা গানগুলো গীতবিতান থেকে পড়তে খুব ভালো লাগে - অনেক কথা বার বার শুনে সব সময়ই কানে লেগে থাকে, কিন্তু একই কথা চোখের সামনে ফুটে উঠলে আন্য একটা মানে এসে দাঁড়ায় - যেন গানটার উপনয়ন হল!!

ব্যাগ থেকে 'শেষের কবিতা'টাই বার করলাম। এতবার পড়েছি যে এখন আমার পাতাও মুখস্ত হয়ে গেছে। আপন মনে পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমি আসতে আসতে বলে চলেছি, 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রনথী ,,,,,,', পাশ থেকে ভেসে এল, 'আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী'!! আমি পরের লাইনটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পাশে ফিরে তাকালাম - পুরোপুরি বিদেশী এক যুবতী আমার পাশে বসে আছে, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, পরনে লম্বা গাউন, মুখে অর্থপূর্ণ হাসি নিয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না দ্বিতীয় লাইনটা কোথা থেকে এলো। আমার পাশে ওই বিবেশী যুবতীটি ছাড়া আর কেউ নেই, আবার স্পষ্ট বাংলাতে ওই বিদেশী যুবতীটির পক্ষেও রবীন্দ্রনাথ আওড়ানো একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হল। তাহলে কি মেয়েটি আসলে বাঙালী? কিন্তু একটা জীবনে এতটা পরিবর্তনও কি সম্ভব? অহেতুক এক সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় পড়া গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হল না। মেয়েটি সরাসরি আমায় জিজ্ঞাসা করল, "Going to SFO?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ,,,,, মানে yes'।

- Very confused? মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

- Are you Bengali? আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম। উত্তরে মেয়েটি আমাকে আরো অবাক করে দিয়ে বলল, 'না, আমার দিদা বাঙালী ছিলেন। আমার বাবা বা দাদু কেউই বাঙালী নন। তবে বাঙলা আমরা সকলেই জানি'। আমি বললাম, 'কি করে?'

- বলতে পারো ভালোবেসে!!

- তার মানে?

- আমার দাদু শুধু আমার দিদাকেই ভালোবাসেন নি, দিদার ভাষাটাকেও ভালোবেসে ফেলেছিলেন। উনিই নিজের উৎসাহে, রথীন্দ্রনাথের সাহায্যে এবং দিদার সহযোগিতায় পুরোপুরি বাঙলা শিখে ফেলেন। সেই থেকে আমাদের পরিবারের দ্বিতীয় ভাষা বাঙলা।

- রথীন্দ্রনাথ মানে কি .....

- হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের ছেলে।

- তোমার দাদু কি শান্তিনিকেতানে পড়তে এসেছিলেন?

- না, উল্টোটা, রথীন্দ্রনাথ আর্বানা শ্যাম্পেন্এ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে এসেছিলেন। আমার দাদু তখন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন, দিদা কি নিয়ে পড়তেন ঠিক মনে নেই, তবে দিদা থাকতেন আর্বানাতেই।

- তার মানে রবীন্দ্রনাথের সাথেও তোমার দিদার বা দাদুর আলাপ পরিচয় ছিলো?

- আলাপ ছিল বলাটা হয়তো ঠিক হবে না, তবে কথা হয়েছিল এবং দাদু খুব কাছ থেকেই রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। একবার ছেলেকে দেখতে এসেছিলেন উনি আর্বানাতে - সম্ভবত সেটাই ছিলো ওনার প্রথম আমেরিকা ভ্রমণ। মায়ের মুখে শুনেছি যে যখন উনি আর্বানাতে ছিলেন তখন কেউই তাঁকে আগে থেকে চিনত না। কিন্তু তাঁর কথাবার্তায়, চিন্তাধারায় এবং জ্ঞানে খুব অল্প দিনের মধ্যেই অনেকে মুগ্ধ হয়ে গেছিল। ক্রমে তিনি আর্বানা এবং শ্যাম্পেন্এ বেশ জনপ্রিয় হয়ে গেছিলেন এবং কয়েকটা বক্তৃতাও করেছিলেন। তবে সব

থেকে প্রভাবিত করেছিলেন আমার দাদুকে।

এক নাগাড়ে ও কথা বলে গেল আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে গেলাম। মেয়েটির পরিবারের সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল - এটাই যেন মেয়েটিকে আমার কাছে এক অন্য আসনে বসিয়ে দিয়েছে। এতদিন সাধারণত দূরদর্শনে বা কারুর স্মৃতি কথায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কাউকে এত নিবিড় ভাবে কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু রক্তমাংসে কেউ আমার সামনে এসে বলে নি যে রবীন্দ্রনাথকে তারা কাছ থেকে দেখেছে, তাঁর কথা শুনেছে, তাঁকে হাসতে দেখেছে, চলতে ফিরতে দেখেছে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে একবার এক বৃদ্ধাকে দেখেছিলাম, তিনি হাঁটু গেঁড়ে বসে রাস্তার নুড়ি কুড়াচ্ছিলেন। আমি অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন তিনি এরকম করছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'শোনো যুবক, আমরা এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছি যখন নিউটন গাছের আম পড়া নিয়ে আর ভাবেন না, ভ্যানগগ তাঁর ভাইয়ের দেওয়া মাসোহারা পুরোটাই রং কিনে খরচ করে ফেলেন না, সকাইলার্ক দেখে কেউ আর কোনো কবিতা লেখেন না, আর কোনো রাজদর্বারে উদগ্রীব হয়ে রাজকর্মচারীরা বসে থাকে না মোৎসার্তের নতুন সিম্ফনি শোনার জন্য। কিনতু এখানকার নুড়ি পাথর ঘাটাঘাটি করলে সেই সময়কার একটা আভাস যেন আমি আমার মনের মধ্যে পাই'। আমারও মনে হল মেয়েটি আমাকে যেন রবীন্দ্রনাথের কিছুটা কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বৃদ্ধটির মত আমারও ইচ্ছে হল মেয়েটিকে একবার স্পর্শ করতে। জানি না সত্যি সত্যি তাকে স্পর্শ করেছিলাম কিনা, কারণ হঠাৎ সান ফ্রান্সিস্কোর প্লেনের ঘোষণা হওয়াতে চারিদিকে একটা চাঞ্চল্য ও শোরগোল শুরু হয়ে গেল; আমিও সম্বিৎ ফিরে পেলাম। মুখ তুলে চাইতে দেখলাম মেয়েটি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হওয়াতে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে চোখ ফিরিয়ে নিল।

বলা বাহুল্য প্লেনেও আমাদের সীট পাশাপাশি হল - তার জন্য যা দৌড়ঝাঁপ করার তা অবশ্য আমিই করলাম। প্লেনেও কিছু কথা হল, তবে আগের মতন আর সহজ সরল ভাবে কথা বলছিল না মেয়েটি; বরং কিছুটা আড়ষ্টই ছিল। তাও আমার মন্ত্রমুগ্ধতা কিছুতেই যেন কাটতে চায় না।

সান ফ্রন্সিস্কো এসে গেল, মেয়েটি 'শীঘ্রই দেখা হবে' বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমার একবারও মনে হল না যে মেয়েটির নাম ধাম ঠিকানা কিছুই জানা হল না। বিশাল সান ফ্রন্সিস্কো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম - বিমূঢ়, ভাষাহীন। যখন বুঝতে পারলাম কতটাই না বোকামি করে ফেলেছি তখন অনেক ছোটাছোটি করেও মেয়েটিকে খুঁজে পেলাম না।

যে কোনওদিনও আমার ছিল না তাকেই হারাবার ব্যাথাটা বড্ড বেশি করে ঘায়েল করে ফেলল আমাকে। লাগেজ ক্লেইমে একটা ব্যাগ বেমালুম ভুলে গিয়ে, ইমিগ্রশনে বেফাঁশ কিছু কথা বলে ফেলে এহেতুক কিছুটা হয়রান হয়ে যন্ত্রের মত ইয়েলো ক্যাব নিয়ে এসে পৌঁছোলাম আমার বাঁধাধরা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে। জেট ল্যাগ, খিদে, অনিদ্রা - সব কিছু মিলিয়ে শরীর একেবারে

বেহাল, তাও কিছু গায়ে লাগছে না।

ফোন বেজে উঠল। বোনের গলা শুনে মনে হল ও খুব উত্তেজিত।

- কেমন লাগল?
- কি?
- জার্নিটা?
- ভালো!!
- সব ভালো?
- মানে?
- মানে হল, ক্যামেলিয়াকে কেমন লাগল?
- ক্যামেলিয়া কে?
- কেন? যার সাথে তুই এলি হংকং থেকে?
- তুই তাকে চিনলি কি করে?
- হাসালি দাদা!! নীপামাসির মেয়েকে আমি চিনব না? ও ছুটি কাটিয়ে স্ট্যানফোর্ডে ফিরে যাচ্ছিল। একই ফ্লাইট শুনে আমরা প্ল্যানটা বানিয়ে ফেললাম। আমাদের সকলের ক্যামেলিয়েকে পছন্দ। এমনকি ওরও তোকে খুব ভালো লেগেছে - এক্ষুণি আমাদের ও ফোন করেছিল। এখন তোর পছন্দ হলেই ....

আমার ইচ্ছের কথা স্পষ্ট করে না বোঝালেও বোন ঠিকই বুঝে গেল। শুধু একটাই আফশোশ রয়ে গেল - নারীজাতির আফিং খাইয়ে বশ করার শিকার আমিও হলাম।

বেঙ্গালোর
২৫/১/৯৯